সত্যজিৎ রায়ের ছবি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

সৌমেন্দ্র নাথ মিত্র

এই আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের যে প্র ভাবায় তা হল কোনও একটি বিশেষ ছবি, তা রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক - এরকম কোনও চিহ্নিত করন আদৌ করা যায় কিনা? কারণ যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাই যে কোন ধরণের শিল্পকর্মই, যা সবক্ষেত্রেই কমবেশী সমাজ জীবনের প্রতিফলন, রাজনীতির আঁচ বাঁচিয়ে বলা তার পক্ষে কি সম্ভব ? একথা ঠিক বিষয়টা এইভাবে ভাবলে যে কোন সিনেমার ক্ষেত্রেই 'রাজনৈতিক' এই বিশেষণটা ব াহুল্য হয়ে যায় ।

সাধারণভাবে রাজনৈতিক সিনেমা বলতে আমরা যে ধরনের ছবির কথা বুঝি সেখানে ছবির বক্তব্য সরাসরি একটা মতাদর্শকে প্রতিফলিত করে। সেখানে পরিচালক দর্শককে ভাবতে বাধ্য করেন। সেই তুলনায় তথাকথিত অরাজনৈতিক ছবিতে এই উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট নয় বলেই দর্শক হিসেবে আমরা তার রাজনীতি থেকে উদাসীন থাকতে পারি।

একথা অনস্বীকার্য সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরেই ভারতীয় সিনেমা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় সিনেমাকে যে নতুন পথ দেখিয়েছিল সেই পথ ধরেই আজও আমরা চলেছি। কিন্তু যখনই তাঁর ছবিকে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি তখন আমরা অনেকেই এই অভিযোগ করে থাকি যে তাঁর ছবিতে রাজনীতি খুব সোচ্চার নয়। এ বিষয়ে হয়ত বিতর্কের খুব একটা অবকাশও নেই। আমরা যখন সমকালীন ভারতীয় সমান্তর াল (Parallel) সিনেমায় সত্যজিতেরই সমসাময়িক মৃনাল সেন, ঋত্বিক ঘটক কিংবা তার পরের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গোবিন্দ নিহালনী, রমেশ শর্মা কিম্বা অরবিন্দনের ছবি দেখি তখন এই অভিযোগ কিছুটা স্পষ্ট হয় । সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মূলতঃ রাজনীতি এসেছে তাঁর আপাত নিরপেক্ষ, কিছুটা নৈবর্ত্তিক আঙ্গি কের মধ্য দিয়ে।

পথের পাঁচালি (১৯৫৫) থেকে আগন্তুক (১৯৯১)— এই দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের চলচ্চিত্র জীবনের পরিক্রমাকে বিশ্লেষণ করলে যে কথাটা প্রথমেই মনে আসে তা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁর প্রবল বিশ্বাস। একথা বহুভাবে বহু জায়গায় সোচ্চারে নিচ্চারে তিনি প্রকাশ করে গেছেন ।তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল প্রতিপাদ্যই অ াবর্তিত হয়েছে এই ব্যক্তিসত্ত্বাকে ঘিরে ।

কিন্তু ব্যক্তিতো কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হতে পারে না। তাকে যে হতেই হবে কোন এক বিশেষ যুগ ও সমাজের প্রতিভূ। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনায় যে তার চারপাশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিফলন জড়িয়ে থাকবে— অসামান্য চলচ্চিত্রবোধ নিয়েও সত্যজিৎ রায়কে দেখি চরিত্রায়ণের এই রীতিতে বরাবর অনীহা প্রকাশ করতে। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য তাঁর ছবির চরিত্ররা বিশেষ কোনও যুগ ও সমাজের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু যখনই তাদের সমাজ ইতিহাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটের নিরিখে মূল্যায়ণ করা হয় তখন যেন মনে হয় ব্যক্তিসত্বাকে উনি বেশী Glorify করতে গিয়ে কখনও কখনও ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে 'জলসাঘরের' কথা বলা যায়। জলসাঘরই তাঁর প্রথম ছবি যেখানে উনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও ইতিহাসের যোগসূত্রতার কথা ভেবেছেন। এ ছবির দুই প্রধান চরিত্র বিশ্বম্ভর ও মহিম দুই বিভিন্ন যুগ ও সামাজিক শ্রেণীর মানুষ। কয়েকপুষ ধরে গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের প্রতিভূ এখানে বিশ্বম্ভর । সামন্ততান্ত্রিক এই ক্ষয়িষ্ণুতাকে যিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তার কাল্পনিক পৃথিবীতে তখনও সেই ফেলে আসা সমৃদ্ধি ও আভিজাত্যের অবস্থান। পৃথিবীর প্রতিফলন— পুষানুক্রমিক দম্ভ আর আভিজাত্য, আর বাস্তবের প্রতিফলন তার দ্রুত নিঃশেষিত পুঁজি— এই দুইকে সম্বল করে উদীয়মান পুঁজিপতি মহিমের ক্রমবর্দ্ধমান বিত্তের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতায় তিনি নেমে পড়েন। সামাজিক পদমর্যাদায় হীন মহিমের ঔদ্ধত্যকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। বৃহদার্থে ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত হয়ে দাঁড়ায় দুই সামাজিক শ্রেণীর সংঘাতেরই নামান্তর। তাই এখানে লক্ষণীয় সত্যজিৎ দুই সামাজিক শ্রেণীর এই প্রতিনিধিদের ঠিক কি চোখে দেখেন ? দর্শক হিসেবে আমরা দেখি মহিম আগাগোড়াই উপস্থাপিত হয়েছে অমার্জিত, অচীশীল এবং খানিকটা যেন হাসির খোরাক হিসেবে। বিশেষতঃ বিশ্বম্ভরের এই আভিজাত্যের পাশে মহিমের এই আচরণগুলি যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পরিচ ালকের অসাধারণ উপস্থাপনার গুণে আমরা কখন যেন বিশ্বম্ভরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। ঐ আপাদমস্তক ফিউডাল মানুষটিকে মনে হয় উদ্ধত হলেও উনি সুক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, বাস্তবজ্ঞানের অভাব থাকলেও জমিদারকে সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে বলে মনে হয়। সবশেষে তার যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাও হয় অত্যন্ত মর্যাদ াপূর্ণভাবে। পাশাপাশি পরিচালক আগাগোড়াই মহিমকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। মহিমের যেকোনও কাজের অন্ধকার দিকটিই আমাদের বেশী চোখে পড়ে। এককথায় বলা যায় মহিম পরিচালকের সহানুভূতি পান নি। সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন— 'হারিয়ে যেতে বসা যাবতীয় ঐতিহ্যেই আমি আগ্রহী। ঐ মানুষটি (বিশ্বম্ভর) আমার কাছে একটি দুঃখী চরিত্র । তার জন্য আমার সহানুভূতি আছে। তিনি অস্বাভাবিক হতে পারেন কিন্তু অনবদ্যও বটে (মিশেল মারদোরে কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৯৮১)

কিন্তু এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে ইতিহাসের নিরিখে সামন্ত প্রভূ অভিজাত বিশ্বম্ভরের তুলনায় অমার্জিত অচিশীল উঠতি বুর্জোয়া মহিম প্রগতিশীল শ্রেণী ? ইতিহাসের গতিকে যে পরিচালক অস্বীকার করেননি এ ছবির পরিণতিই তার প্রমাণ। তবু মনে হয় ইতিহাসের এই ধারাকে তিনি স্বাগত জান াতেও পারেন নি বরং ব্যক্তিসত্তার প্রতি তার প্রবল বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ছবির কথা মনে আসে, 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' (১৯৭৬) । এ ছবিতে সত্যজিৎ রায় চলে গেলেন আরও পিছনে। ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় সামন্ততন্ত্র আর বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত। প্রেমচন্দের কাহিনী অবলম্বনে ১৮৫৬ সালের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অযোধ্যা অধিকারের কলঙ্কিত

অধ্যায়ই সত্যজিতের এই ছবির মূল উপজীব্য। ঘটনার চরম মূহুর্ত পরিচালক Symbolize করেছেন নবাব ওয়াজেদ আলী সহ আর রেসিডেন্ট জেনারেল আউট্রামের দাবা খেলার মাধ্যমে।

সামন্ততন্ত্রের আত্মসমর্পণের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে এখানে দায়ী করা হয়েছে সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়কে। এর প্রমাণ দিতেই যেন সত্যজিতের ক্যামেরায় ধরা পড়ে ওয়াজিদের আলস্য, রাজ্যশাসন সম্পর্কে অনীহা, উদাসীনতা, তার সৌন্দর্য্যপ্রীতি, অন্যান্য বিষয়ে অধিক উৎসাহ । এ সমস্ত কিছুকেই পরিচালক ব্যঙ্গ করেছেন । কিন্তু পাশাপাশি তিনি আশ্চর্যজনকভাবে একটি জরী বিষয়কে এড়িয়ে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদী সুযোগসন্ধানী ব্রিটিশদের চক্রান্তকে তিনি কারণ হিসেবে খুব বেশী গুত্ব দেন নি ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'জলসাঘর' ও 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র সামন্ততন্ত্রের চরিত্র কিন্তু এক নয়। 'জলসাঘরে'র সামন্ততন্ত্র এসেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল হিসেবে আর বশ্যতামূলক মিত্রতার প্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে শতরঞ্জ কি খিলাড়ীর সামন্ততন্ত্র । বৃটিশ শাসনে এই উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের ধারাবাহিকতা থাকলেও তাদের (বৃটিশ) প্রয়োজনে এর চরিত্র ক্ষণে ক্ষণে বদলেছে। সত্যজিতের ছবিতে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এর পিছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা যেন কিছুটা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে ।

মজার ব্যাপার, 'জলসাঘর' এবং 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' — এই দুটি ছবিতে সামন্ততন্ত্রকে সত্যজিৎ রায় দেখছেন দুভাবে। জলসাঘরে জমিদারের মহিমাই আমরা দেখেছি,যা তার প্রতি পরিচালকের সহানুভূতিরই প্রকাশ। পাশাপাশি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'তে ওয়াজেদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ সত্যজিৎ তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই স্ববিরোধীতা তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের প্রতি বিশ্বাসেরই প্রকাশ। ফলে দুক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসের ভূমিনকাকে সঠিকভাবেনির্দেশশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিধাহীনভাবেই একটা কথা বলা যায়, সত্যজিৎ রায় কখনও প্রবল কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস বা তাড়না থেকে কোনও ছবি করেন নি। তাঁর নিজের কথাতেই—'কোনও রকম গালভরা প্রচারমূলক বক্তব্য পেশ না করে আমার ছবিতে আমার গল্পটাকেই আমিন উপস্থিত করতে চাই। (I like to present stories- Sunday observer, 1982— পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক পর্যন্ত সমস্ত ছবিতেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাই আমরা দেখতে পাই। অবশ্য আমরা এও দেখি যেহেতু তিনি তাঁর বেশীরভাগ বক্তব্যেই ইতিহাসের অগ্রগতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন সেহেতু তাঁর বেশীরভাগ ছবিরই বোধহয় একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

যে কারণে তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন, তা হল, তিনি এমনই এক শিল্পী যিনি তার শিল্পের মাধ্যমে মানবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই মানবধর্ম কোনও ভাববাদী চিন্তার ফসল নয়, বরঞ্চ আপাতমস্তক বাস্তব থেকেই উঠে আসা। আমরা জানি উনি ওনার প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' করার প্রেরণা পান ডি-সিকার 'বাইসাকেল থিভস' দেখার পর, যা থেকে হয়ত অনুমান করে নেওয়া যায় ইতালির নিও রিয়ালিজম্ ওনার মনে দাগ কেটেছিল, যার মূল বাস্তববাদ অপুত্রয়ী ছবিগুলির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল ।

'পথের পাঁচালী'ই সম্ভবত একমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্র যেখানে শিল্পের মহিমা আর জীবনের শাশ্বত প্রবাহ একসাথে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করছে এক অনন্য সুন্দর কাব্যিক সুষমা। এই ছবি হবার পর কেটে গেছে আরও চারটে দশক কিন্তু এ ছবিকে ঘিরে আমাদের মুগ্ধতা, গর্ব, আলোচনা আর তর্কবিতর্কের কোনও শেষ আজও হয়নি। তবু যেন মনে হয়, আমরা এই মধ্যবিত্ত বঙ্গ সন্তানেরা পথের পাঁচালীর গ্রাম বাংলাকে নিয়ে এক ধরনের ভাবাবেগ বা অতীতের প্রতি পিছুটান (নষ্টালজিয়া) থেকে মুগ্ধ কাব্যই শুধু করে গেলাম। এর আর্থ সামাজিক চিত্রটা আমাদের চোখ এড়িয়েই থাকল। কেউ কেউ হয়ত ভু কোঁচকাবেন এই ভেবে যে আমি অনর্থক পথের পাঁচালীতে রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করছি। তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা 'পথের পাঁচালী'র ওই মহাকাব্যিক উপলব্ধিও তো এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকেই উঠে আসা, কাজেই এতে রাজনীতি থাকবে নাই বা কেন?

নিশ্চিন্দিপুরের রায় পরিবারের ওপর হঠাৎই নেমে আসা অর্থনৈতিক সঙ্কট কি শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? ভেবে দেখুন, ভারতীয় গ্রাম্য সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার সাহায্য গড়ে ওঠা যে অর্থনীতি, যাকে কার্ল মার্কস 'অচলায়তন' বলে অভিহিত করেছিলেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী প্রভাবে তাতে ভাঙন ধরতে শু করেছিল। 'পথের পাঁচালীর সময়কাল এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণ যখন এই ভাঙনের বাস্তব চিত্রটা প্রকাশ পেতে শু করেছে। ছবি যত এগিয়েছে আমরা দেখেছি নিশ্চিন্দিপুরের সেই Lyrical আমেজ কখন যেন বদলে যেতে যেতে কঠিন কঠোর গদ্যকাব্যে পরিণত হচ্ছে। একদিকে তীব্র অর্থসংকট আর একদিকে শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সেই চিরাচরিত সংস্কার - এই দুই-এর টানাপোড়েন রায় পরিবারের destiny ই বদলে দিয়েছিল। এই destinyই পুতঠাকুরের ছেলে অপুকে তার পৈতৃক বৃত্তি গ্রহণ না করে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। অপুত্রয়ীতে আমরা বারবার দেখতে পাই অপুর একাকীত্ব, অপুর ছুটে চলা - loneliness of a long distance runner.

আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়কে তাঁর শিল্পীজীবনে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতে। এ থেকেই বোধহয় বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, ইনি ছিলেন শতকরা একশভাগ শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ। তিনি ছিলেন মূলত story teller . সেলুলয়েডের ভাষায় ছিল তার অনায়াস অধিকার। আর ছিল এক অনন্যসাধারণ নান্দনিক দৃষ্টি। যার সাহায্যে তিনি আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন একের পর এক অসাধারণ সব শিল্পকর্ম।

আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন জাগে 'রাজনৈতিক সিনেমা' সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা ছিল ? ওঁর ভাষাতেই বলা যাক,— "ভারতে বসে আপনি রাজনৈতিক চরিত্র রাখতে পারেন। কিন্তু সত্যিকারের পলিটিক্যাল ফিল্ম হওয়া সম্ভব নয়।" রাজনৈতিক সিনেমা বলতে আমাদের যার কথা সর্বাগ্রেই মনে আসে সেই মৃনালসেন সম্পর্কেও সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য ছিল — "যদি খুব খুঁটিয়ে দেখা যায় মৃনাল সেন কি করছেন, তবে বোঝা যাবে তিনি বেশ safe targets attack করছেন" । (London National Film Theatre - এর সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন) । তাঁর এই ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বিতর্কের দাবী রাখে সন্দেহ নেই। আবার এর যুক্তিগ্রাহ্যতাকেও বোধহয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় সিনেমায় সম্ভবত প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছিলেন ঋত্বিক ঘটক তার ছবি 'নাগরিকে' (১৯৫২)। তারপরে প্রায় দুটো যুগ ভারতীয় সিনেমায় রাজনীতি খুব সোচ্চারভাবে আসেনি। যাকে অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগরে' আমরা দেখেছিলাম অর্থনৈতিক চাহিদাকে একটি পরিবারের চিরাচরিত সংস্কারের মূলে কুঠারঘাত করতে। ঋত্বিক ঘটকও ছিন্নমূল মানুষদের অস্তিত্বের সঙ্কট তীব্রভাবে তুলে ধরেছেন 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণ রেখা' তে।

আবার রাজনীতি এল মৃনাল সেন এর ছবিতে সত্তর দশকের শুতে। সম্ভবত তিনি নকশালবাড়ী আন্দোলনের সেই অগ্নিদিনগুলির আঁচে উদ্দীপ্ত হয়েই সিনেমায় সরাসরি রাজনীতি আনার কথা ভেবেছিলেন। তার প্রথম রাজনৈতিক ছবি ইন্টারভিউ (১৯৭০) । এ ছবিতে তিনি জীবনের সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি যোগাযোগ দেখানোর কথা বলেছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য ভারতীয় সিনেমায় এক সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা। এরপর তার কাছ থেকে আমরা পেলাম পর পর আরও দুটি ছবি— কলকাতা ৭১' এবং পদাতিক।

আমরা অবশ্যই মৃণাল সেন এর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ সে সময়ে অধিকাংশ বাঙালী বুদ্ধিজীবি ঐ দামাল ছেলেগুলোর আচরণে বিরক্ত, দিল্লীর 'বড়দিদি'র অনুগ্রহ হারানোর ভয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকোতে ব্যস্ত (এদের কেউ কেউ আবার ওদের নিয়ে পরবর্তীকালে রোম্যান্টিক কাব্য সাহিত্য করেছেন)- সে সময়ে মৃণ

াল সেনকে আমরা দেখেছি এ বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন, তাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইছেন। তবে গলদটা বোধহয় গোড়াতেই ছিল। যতই হে াক, উনি তো সেই শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীরই মানুষ, একথা অনস্বীকার্য ঐ আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ছিল, সহানুভূতি ছিল। Intellectually তিনি ঐ আন্দোলনের শরিকও হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি যে শিল্পের উপজীব্য, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কোনও আপোষ সেখানে চলে না। জীবন সেখানে যুদ্ধের ডাক দেয় না সেখানে শুধু মতাদর্শগত আন্তরিকতাকে সম্বল করে শ্রেণীঘৃণাকে মনের মধ্যে লালন করা খুব কঠিন। তাই বোধহয় মৃনাল সেন অনেকটা পারলেও শেষটায় উতরোতে পারেন নি।

তাঁর ছবিতে আমরা দেখেছি বৃহৎ প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক চেতনা চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রীক হতে গিয়ে হারিয়ে গেছে (ইন্টারভিউ)। কখনও বা আমরা দেখেছি তাঁর সেলুলয়েডের ভাষা এতটাই complex form এ এসেছে যে দর্শক হিসেবে আমরা confused হয়ে গেছি। উদাহরণ স্বরূপ 'পদাতিক' বা 'কোরাসের' কথা বলা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে ওনার রাজনৈতিক বোধ আর সেলুলয়েডের ভাষায় এক চমৎকার বোঝাপড়া লক্ষ্য করা গেছে। ৮০'র দশকে 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ' এবং 'আকালের সন্ধানে'র মত রাজনৈতিক ভাবনায় সমৃদ্ধ, অনবদ্য তিনটি ছবির কথা তো আমরা ভুলতে পারিন া।

এ ছাড়াও আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালক যারা রাজনৈতিক ছবি করেছেন বলে দাবী করেন, তাদের ছবি দেখেও মনে হয় তাঁরাও কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল প্রবাহকে তুলে না ধরে, তার প্রকৃত কারণকে বিশ্লেষণ না করে তার effect এর উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। সম্ভবত এই বিষয়টিকেই সত্যজিৎ রায় safe targets বলতে চেয়েছিলেন। Target টা অতটা safe নয় বলেই কি ভূপালগ্যাস দুর্ঘটনা, আড়োয়াল কিম্বা সফদর হ াসমী বা শঙ্কর গুহ নিয়োগীদের হত্যাকাণ্ড কোনও ছবির বিষয় হতে পারে না ? ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়, গত এক দশকের মধ্যে তৈরী হওয়া গোবিন্দর নিহালনীর 'আঘাত' বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'গৃহযুদ্ধ' রমেশ শর্মার New Delhi Times বা সথ্যুর 'গরম হাওয়া' কে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্র াসঙ্গিক বলেই মনে হয়েছে ।

প্রসঙ্গ যেখানে সত্যজিৎ রায়ের ছবি সেখানে অনিবার্যভাবে যে প্র্ন এসে যায় তা হল, চারপাশে ঘটে যাওয়া বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের দর্শনটা তাঁর ক াছে ঠিক কি ছিল? ঊনসত্তর-সত্তরের ঐ উত্তাল আন্দোলনের রক্তঝরা দিনগুলিতে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেলাম অরণ্যের দিনরাত্রি। আমরা অবশ্যই প্র্ন করতে পারি কেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'? অবক্ষয় দেখানোর অর্থ নিশ্চয়ই নৈরাজ্যবাদকে তুলে ধরা নয় ? তাও আবার সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে? তাই প্র্ন জ াগে, এ কি নিছক গল্প বলার জন্যই গল্প বলা, নাকি আন্দোলন সম্পর্কে নিজের নিস্পৃহতাকেই প্রকাশ করা ?

একান্তরে মুক্তি পেল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্বভাবত সংযত ভঙ্গীতে আমাদের বোঝালেন চারপাশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনের আঁচ তাকেও স্পর্শ করেছে। এ ছবির উপজীব্যও তাণ্যের সমস্যা। নায়ক সিদ্ধার্থ নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্থিত না হয়েও প্রাতিষ্ঠানিকতার বিদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সে বিবেকবান অথচ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার কথা ভাবে। অথচ এর গ্লানি থেকেও মুক্তি পায় না। এ ছবিতে আরও পারি সিদ্ধার্থের ছোট ভাই টুনুকে— নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত অবশ্যই রাগী কিন্তু উজ্জ্বল একটি চরিত্র। আক্ষেপ আমাদের পরিচালক এই চরিত্রটিকে আর একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা বোধহয় লাভ বান হতাম। অপরদিকে দেখতে পাই অবক্ষয়ের শিকার বোন সুতপা আর মেডিকেল কলেজের বন্ধু আদিনাথকে। এই টানাপোড়েনে পির্যস্ত, ব াস্তব তেকে পালাতে চাওয়া সিদ্ধার্থ আশ্রয় খোঁজে প্রেমিকার কাছে । তবু কি পালানো যায় ? তাই পাখীর ডাকের সাথে সাথে আমাদের কানে আসে রাম নাম সৎ হ্যায়। অসাধারণ উপস্থাপনা। এই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের রাজনীতি মনস্কতার প্রকাশ অতি স্পষ্টভাবে আমরা দেখলাম।

এরপর কয়েক বছরের ব্যবধানে আমরা পেলাম সীমাবদ্ধ (১৯৭৪) এবং জন-অরণ্য (১৯৭৫) প্রতিদ্বন্দ্বী'র মূলভাবের ছায়া আমরা এ ছবি দুটিতেও দেখতে পাই। সীমাবদ্ধর শ্যামলেন্দু আর জন অরণ্যের সোমনাথের সমস্যাটা এক নয় । তারা বিবেকবান তবু যে যার মতো বেঁচে থাকার স্বার্থে কোন না কোনও অন্যায়ের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিবিধ টানাপোড়েনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই ছবিগুলি। স্পষ্টতই এই ছবিগুলিতে আমরা সত্তরের ঐ উত্তাল সময়ের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই। রাজনৈতিক উত্তেজনা কমে গেলেও মধ্যবিত্ত জীবন তার সামগ্রিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি- এ ছবিগুলি আমাদের এই কেন্দ্রাতিক উপলব্ধিতেই পৌঁছে দেয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের আর এক নির্মম রূপ আমরা দেখলাম ফরাসি টেলিভিশনের জন্য নির্মিত মাত্র ২৬ মিনিটের ছবি পিকুতে (১৯৮০) । ছোট্ট ছেলে পিকুর চোখ দিয়ে আমরা দেখলাম বড়দের প্রেমহীন প্রত্যাশাহীন বেঁচে থাকার জগৎ। আধুনিক শহুরে বিত্তবান পরিবারের স্বামী স্ত্রীর প্রেম হীন দাম্পত্য-জীবন, স্ত্রীর পরপুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, শিশুর নিঃসঙ্গতা— এ সবই উপজীব্য সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিতে। সামগ্রিক পরিস্থিতির এই নীতিহীনতাকে তিনি তুলে ধরেছেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। নান্দনিকতা আর প্রতীকীর অসাধারণ সমন্বয় আমরা দেখেছি এছবিতে— পিকু তার রঙের বাক্সে রং পায় না বলে পরিবর্ত রং হিসেবে বেছে নিচ্ছে কালোকে— এ ছবি চেতনাকে আঘাত করে। মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করে।

এরপর আমরা পেলাম সদ্গতি (১৯৮১)। ভারতীয় দূরদর্শনের জন্য নির্মিত প্রেমচন্দের এই ক্ল্যাসিক গল্পটি নিঃসন্দেহে সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। অনেকদিন পর শহুরে জীবন থেকে উনি সরে এলেন মাটির আরও কাছাকাছি আরও বড় প্রেক্ষাপটে । বাহান্ন মিনিটের এই ছবিতে তিনি সরাসরি ও আরও তীক্ষ্নভাবে আক্রমণ করলেন জাতপাতের বৈষম্য ও হরিজন নিগ্রহকে । এ ছবি তৈরী হওয়ার পর কেটে গেছে আরও একদশক । দ্বারভাঙা কিম্বা রায়গড়ের হরিজন বস্তীতে দুখী চামারদের বেঁচে থাকা ও মৃত্যু আজও ভয়ঙ্কর রকম প্রাসঙ্গিক।

১৯৮৪ সালে আবার উনি ফিরে এলেন রবীন্দ্র সাহিত্যে। 'ঘরে বাইরে' মুক্তি পেল। এ ছবি হবার কথা ছিল 'পথের পাঁচালী'রও আগে। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি অনুরাগেই সম্ভব বার বার তিনি ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে। এর আগে আমরা পেয়েছি 'পোষ্ট মাস্টার', মনিহারা, সমাপ্তি, আর চালতা। এর মধ্যে চালতা নিঃসন্দেহে ক্ল্যাসিক। শুনেছি ঘরে বাইরে করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। আমাদের প্রত্যাশাও তাই বেড়ে গেছিল বহুগুণ। কিভাবে ব্যাখ্যা করবো এ ছবিকে? এটা কি একটি রাজনৈতিক ছবি? যে ছবির পটভূমি এ শতাব্দীর শুতে বাংলাদেশের এমনই এক অস্থির সময়ে যখন থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শু এবং বৃটিশ প্রবর্তিত divide & rule এর প্রয়োগ, তার প্রেক্ষাপটকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এ বিষয়ে নিশ্চই কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু ছবি যত এগিয়েছে আমরা তত অবাক হয়ে দেখেছি এই বৃহৎ প্রেক্ষাপট ক্রমশ ছোট হয়ে এক ত্রিকোণ প্রেমের ট্রাজিক গল্পে রূপান্তরিত হল। আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' থেকে সত্যজিৎ রায় অনেক সরে এসেছেন। একথা অনস্বীকার্য , যে কোনও সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রর ক্ষেত্রেই সেলুলয়েডের নিজস্ব ভাষার দ াবীতেই এই সরে আসাটা জরুরী। সত্যজিৎ রায়ই 'চালতায়' সার্থকভাবে এটা আমাদের করে দেখিয়েছেন। কিন্তু প্র্ন আসে— (ক) এই পরিবর্তনের প্রকৃতি ঠিক কি ধরনের? (খ) কতটা পরিবর্তন কাম্য এবং কেন কাম্য? সত্যজিতের ঘরে বাইরে দেখে যা মনে হয়েছে—

(১) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত দর্শনও সঠিক প্রয়োগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্র্ন রেখেছিলেন যা লিখিলেশ ও সন্দীপের এই আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য থেকেই প্রকাশ পায়— সেই মূল উপলব্ধিই তো এই ছবিতে অনুপস্থিত।

(২) সন্দীপের চরিত্রে কোনও দ্বন্দ্ব না দেখানোয় সন্দীপ ক্রমশ ভিলেনে পরিণত হয়েছে ।
(৩) এ ছবিতে বিমলা সব থেকে উপেক্ষিত । পরিচালক বিমলাকে কোনও বিশ্লেষণ না করার ফলে চরিত্রটি কোনও অবয়ব পায় না।
(৪) এ ছবিতে লিখিলেশের মৃত্যু কেন দেখানো হন ? এ মৃত্যু আদৌ জরী ছিল? না কি ট্রাজিক প্রেমের সমাপ্তির সূচক হিসেবেই একে আমরা ভাবতে পারি?

এক কথায় যে ছবি বৃহৎ এর রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারতো, তা পরিণত হল নিছকই এক গল্পে।

ঘরে বাইরের পর সত্যজিৎ রায় অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন ছবির জগৎ থেকে দূরে সরে ছিলেন। আবার ফিরে এলেন ১৯৮৯ এ। এরপর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আরও তিনটি ছবি করে গেছেন। আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বদলে গেছে ওনার সেলুলয়েডের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীও। বিষয় নির্বাচনেও অনেক সমকালীন হয়ে পড়েছেন। 'গণশত্রু' (১৯৮৯) নিঃসন্দেহে Experimental ছবি। ইবসেনের বিখ্যাত নাটক 'এনিমি অব দি পিপল' এর অনুসৃষ্টি বা বঙ্গীকরণ বলা যেতে পারে এ ছবিকে। অবশ্যই নাটক এবং সিনেমার ভাষা আলাদা এবং উনবিংশ শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া আর বিংশ শতাব্দীর শেষের পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক পটভূমিও এক নয়। যদিও দু-ক্ষেত্রেই ডাক্তারের লড়াই এর মূল জমিটা একই থাকে। একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বলিষ্ঠছবি হয়ে ওঠার সমস্ত উপাদানই এতে ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে যা ছিল না, তা হল সত্যজিৎ রায়ের উপস্থিতি। কোথায় গেল সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আঙ্গিকের প্রয়োগ? কোথায় গেল সেই পরিমিতি বোধ ? এ ছবির চরিত্রদের চলাফেরা সবই কেমন যেন আরোপিত মনে হয়। প্রশ্ন আসে কাগজের সম্পাদককে অসৎ দেখানোর আর কি কোন রাস্তা ছিল না ? নাগরিক সভার কথোপকথনকে কি কোন্য ভাবেই বাস্তব সম্মত বলা যায়? 'এনিমি অব দি পিপল'-এর সমাপ্তিতে Dr. Stockman' র নিঃসীম একাকীত্বের যে গভীর উপলব্ধি যা আমাদের চেতনাকে ছুঁয়ে যায়, তার পরিবর্তে এ ছবিতে পাই এক স্লোগান ধর্মী সমাপ্তি। আর যা কিছুই বলি না কেন এ ছবিকে সত্যজিৎ রায়ের ছবি বলতে কোথায় যেন আটকায় ।

উপসংহার ঃ

তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় আমরা দেখেছি ঐতিহ্য ও আধুনিকতা যা বিভিন্ন form এ শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থেকে উঠে এসেছে— মূলতঃ এই ছিল তাঁর প্রায় সব ছবিরই বিষয়। অবশ্যই এসবের উর্দ্ধে তাঁর মূল লক্ষ ছিল মানবতা। অনেক কঠিন সময়েও মানব স ম্পর্কের মরমী বিশ্লেষণে তিনি আমাদের আশার আলো দেখিয়েছেন। পিকুর প্রেমহীন নিঃসঙ্গ ঐ পৃথিবীতেও আমরা দেখি অসুস্থ দাদুর সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ। ' গুপী গাইনে' হল্লার রাজার মুক্তি পেয়ে 'ছুটি ছুটি' বলে ছুটে চলা আমাদেরও মুক্তির দিগন্ত দেখিয়ে দেয় ।

কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যখন তাকে দেখি তখন মনে হয় এই চলার পথে বিশেষ কোনও মতাদর্শের প্রতি তিনি কমিটেড ছিলেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও একটা পরিস্থিতিকে বিচার করেছেন একেবারে ব্যক্তিগত স্তরের ভালোলাগা থেকে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে মাও-সে-তুঙের সেই বিখ্যাত উক্তি — ' Who are you enemies? Who are your friends? This is a question of first importance for the revolution.' এই আত্মজিজ্ঞাসা, এই চিহ্নিত করন সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবিতেই আমরা পাইনি। এটাও ওনার সততা। বেড়া ডিঙিয়ে ওপাড়ায় যেতে চান নি। কারণ যথার্থভাবে যেতে পারতেন না বলে ।

আমাদের দেশে সত্যিকারের রাজনৈতিক ছবি ততদিন পর্যন্ত হওয়া সম্ভব নয় যতোদিন পর্যন্ত না শোষণ সরাসরি আরও প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জীবনে নেমে আসবে। বাতাসে বাদের গন্ধ নেই। চারিদিকি বেশ একটা আপাত শান্তি বিরাজ করছে। আমরা এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা বেশ সুখেই আছি। এই পরিস্থিতিতে হয়ত আমাদের অনেক পূণ্য ফলে এক সত্যজিৎ রায়কে পাওয়া গেল; কিন্তু একজন ইলমাজ গুনেকে পাওয়া — সম্ভব নয় ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com